Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পুরাণ

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিদ্দিকা মাহমুদা
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.3
Pages	49-80
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পুরাণ

সিদ্দিকা মাহমুদা

পুরাকাল থেকে অভিব্যক্ত 'পুরাণ' সাহিত্যের এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ উপাদান। পৌরাণিক বিশ্বাসের জগৎ থেকে বহুদূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ কবিতায় তার সাগ্রহ লালন ও পরিচর্যা করেছেন। প্রধানতঃ ঐতিহ্য নিষ্ঠা, পুরাণ-প্রসঙ্গের সংগে আশৈশব যোগাযোগ এবং আধুনিক কালে পুরাণের বিশেষ সাহিত্যিক মূল্যায়ন তাঁকে পুরাণ প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করেছে। তবে লক্ষণীয় এই যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশেষ বোদ্ধা ও অনুরাগী কবি পুরাণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্যে দৃঢ়মূল।

পুরাণ একই সংগে বাস্তব ও কল্পনায় সূত্রবদ্ধ, ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিশেষ স্তরলগ্ন; মানুষের সীমাবদ্ধতা ও আকাঙ্ক্ষার যুগ্ম-স্রোতে লালিত। এ কালের কবির কাছে পুরাণের মূল্য অপরিসীম, কারণ আধুনিক যুগযন্ত্রণার প্রেক্ষিতে পুরাণ পেয়েছে ভিন্নতর তাৎপর্য। যন্ত্রশক্তির দুরন্ত আধিপত্য এবং মানবীয় ক্ষমতার খণ্ডীভবন, স্বাচ্ছন্দ্যের বিচিত্র আয়োজন এবং জীবনের করুণতম ব্যর্থতা—এ সবের মিলিত সহযোগে যে অসম পরিবেশ তারই আততিতে কবিতায় পুনর্জন্ম অলৌকিক বা অতি-মানবিক চরিত্রনিচয় ও ঘটনাসমূহের, পূর্বপুরুষের অসহায়, শঙ্কিত জীবন-ভাবনায় একদা যা কল্পনার ঐশ্বর্যে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল।

বিশেষ দেশ- কালের পটভূমিকায় ম াইকেল মধুসূদন দত্ত পুরাণের নবায়ন ঘটিয়েছেন। রাবণের কণ্ঠে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলিত মানবাত্মার আর্তনাদ, *মেঘনাদবধের* রূপকে উদ্ভাসিত সমগ্র দেশের অসহায় ক্ষরণ, *'বীরাঙ্গণা'য়* ঘোষিত নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, *'ব্রজাঙ্গনা'য়* Mrs. Radha-র নবমূর্তি; রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানী আখ্যান, *কর্ণ-কুন্তী সংবাদ* অনুরূপ ঔপনিবেশিক

যন্ত্রণা-জাত পটভূমির উচ্চারণ। তবে রবীন্দ্রকাব্যে নানাসূত্রে পৌরাণিক জন্মান্তর, লীলা ও ভক্তিবাদের প্রকাশ ঘটেছে। নজরুল-মোহিতলালেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন পুরাণের সচেতন পরিচর্যা। তিরিশের কবিদের প্রধানতঃ প্রভাবিত করেছে ইয়েটস্-এলিয়টের মিথ-চেতনা। যুগের নৈরাজ্যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী মিথের মাধ্যমে তাঁরা যে প্রতিরোধ গড়েছিলেন তিরিশের কবিরা তার সচেতন অনুসরণ করেছেন। পূর্ববর্তীদের ন্যায় আবেগসূত্রে নয়, মননের ঔজ্জ্বল্যে এই পুরাণ-প্রয়োগ। বিশেষতঃ তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি বিষ্ণু দে-র কথা উল্লেখ্য, যিনি পুরাণকে গ্রহণ করেছেন বক্তব্য প্রকাশের বিশেষ মাধ্যমরূপে। তাঁর কবিমানসের বিবর্তনের সঙ্গে পুরাণ-প্রসঙ্গের যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। তিনি প্রথমাবধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ বিহারী; উর্বশী-আর্টেমিস, উলূপী-প্রসার্পিনা, কুরুক্ষেত্র-ট্রয় ইত্যাদি বিচিত্র পুরাণ কখনও বৈপরীত্যে, কখনও একাত্মতায় সেখানে পরস্পর-লগ্ন। কাসান্দ্রা, আন্দ্রমিদা, টাইরেসিয়াস, হেলেন, নেয়াড জাতীয় পাশ্চাত্য বহু পরিচিত-অপরিচিত পুরাণ তিনি অবলীলায় প্রয়োগ করেছেন, তবে উত্তরকালে বিষ্ণু দে দেশজ এবং লোকজ পুরাণে উপনীত। প্রথম পর্যায়ে বিষ্ণু দে-র মননসমৃদ্ধ কবিমানস যেমন পুরাণচেতনায় পরিস্ফুট, সাম্যবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ তেমনই পরবর্তীকালের লোক-পুরাণ ব্যবহারে, অভিজাত-অনভিজাত পুরাণের মিশ্রণে। অনস্বীকার্য, তিরিশের কবিদের মধ্যে কাব্যাঙ্গিক হিসেবে পুরাণ-প্রযুক্তিতে বিষ্ণু দে স্বতন্ত্র এবং অনন্য। বুদ্ধদেব বসু পুরাণ ব্যবহার করেছেন কবিতার ভাব পরিবহনের প্রয়োজনে; তাঁর প্রেম-চেতনার ঋতুবদল পুরাণাশ্রয়ী। যৌবনের উন্মাতাল অস্থিরতা অতিক্রম করে যখনই তিনি প্রেম-সৌন্দর্য-জীবন ও সৃষ্টিরহস্য সন্ধানে নিবিষ্ট, পুরাণ এসেছে সহায়ক বাহন হয়ে; *'দময়ন্তী'* (১৯৪৩), *'দ্রৌপদী'র শাড়ী'* (১৯৪৮) তারই প্রকাশ। উত্তরকালের বোদলেয়ার-প্রভাবিত বুদ্ধদেব বসু উপমা-চিত্রকল্পে পুরাণের বিষয়সংলগ্ন প্রকাশ ছাড়া কবিতায় কোন ভিন্নতর পরিচর্যা করেন নি। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পুরাণ নিঃসন্দেহে ভিন্ন স্বাদ সঞ্চারক। তার লোকজ স্মৃতিশায়ী পুরাণ বাংলা কবিতায় যোজনা করেছে বর্ণ-গন্ধের এক স্বতন্ত্র আমেজ। রূপকথার শঙ্খমালা-চন্দ্রমালার পাশাপাশি উল্লেখিত বেহুলা-সনকা-চাঁদ সদাগর-সীতারাম-রাজারাম-রামনাথ রায়ের বিষাদময় নাম, তারা স্মৃতিভারাতুর দূরবনগন্ধবহ রূপসী বাংলার প্রতিনিধি--যে রূপসী বাংলা জীবানন্দের হাতে নিজেই মিথে পরিণত। তবে জীবনানন্দ আদ্যন্ত ইতিহাস-সচেতন ব'লে পুরাণ-প্রকল্পনা তাঁর কাব্যে বিস্তৃততর হয়নি; ব্যবিলন, মিশর, বিদিশা, ত্রবেদুর, বনলতা সেন, শেফালী ঘোষ সেখানে পুরাণের প্রয়োজন পূরণ করেছে।

বলা যায়, পুরাণ-প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে সমমানসিকতাসম্পন্ন। উভয়েই মননের ঘনিষ্ঠ সহযোগে পুরাণমুখী। উভয়ের কাব্যে কবিচেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সংলগ্ন পুরাণের ব্যবহারিক বিবর্তন, কবিমানসের প্রতীকী অন্বেষা পুরাণ-চেতনায় আশ্রিত। তবে, সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র ন্যায় পুরাণ ব্যবহারে বহুব্যাপক নন, বিষ্ণু দে যেখানে দেশী-বিদেশী পুরাণ প্রয়োগে সব্যসাচী, সুধীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বদেশলগ্ন; প্রতীচ্য পুরাণ ব্যবহারে অত্যন্ত সংযত। সুধীন্দ্রনাথের পুরাণ-প্রযুক্তি যুগপৎ কবিমানস ও কবিতার ভাববহনে, ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার উচ্চারণে, পারিপার্শ্বিক বিরোধিতা ও বিশ্বগত বিপর্যয়ের যন্ত্রণাভার প্রকাশে নিহিত। তবে বিষ্ণু দে যেহেতু বৈষম্যমুক্ত এক দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ পৃথিবী-নির্মাণে উৎসুক, তাই তাঁর পুরাণ অন্ধকার-অতিশায়ী সম্ভাবনার সৈকতে উপনীত, সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর যন্ত্রণাদীর্ণ ক্ষতকেই চিহ্নিত করেছেন, উত্তরণের পথ খুঁজে পাননি।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাচ্য পুরাণ অবিরলভাবে প্রযুক্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে তা কেবল তাৎপর্য বা অনুষঙ্গ-আশ্রয়ী, কাহিনী বা ঘটনার অনুপুঙ্খ অনুসরণ নয়। মহাশক্তিধর আদিদেব শিবের সঙ্গে তিনি বোধ করেছেন বিশেষ সাযুজ্য। বিশেষতঃ শিব-পার্বতীর উপাখ্যান, দক্ষযজ্ঞে শিবের অনিমন্ত্রণ, সতীর দেহত্যাগ, স্মৃতিভারাক্রান্ত শিবের ধ্যানমগ্নতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ মিলিয়ে নিয়েছেন নিজস্ব প্রেমভাবনায়। তাছাড়া, শিবের তমোগুণসম্পন্ন রুদ্ররূপ এবং দুর্গার কালীরূপী সংহারমূর্তি তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ সুধীন্দ্রনাথের কবিমানস যেহেতু প্রেম এবং প্রেমোত্তর শূন্যতাবোধে সংসক্ত, এ-কারণে শিব-পার্বতীর প্রেমিক এবং বৈনাশিক সত্তাদ্বয় তাঁকে আকর্ষণ করেছে।

বিদেশিনী প্রেমিকার অন্তর্ধানের ফলে বাসন্তী উৎসবে কবির অংশ নেই, স্মৃতিতাড়িত সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে একীভূত করেছেন দক্ষযজ্ঞে অনাদৃত শিবের সংগে—

তাই যবে বসন্তের উচ্ছৃঙ্খল দিনে,
গতাসু বরষে,
সহসা উঠিল জেগে নিম্বের বিপিনে
বিহ্বল চন্দনগন্ধ মলয়ের কবোষ্ণ পরশে;
ধৈর্যহীন অপব্যয়ে বৃথা পুষ্পাঞ্জলি
বসুন্ধরা নিজেরে অর্পিল;
বন্দ্য অলি

তালে বেঁধে দিল
সৃষ্টির স্বয়ম্ভূ সামগান;
উৎকণ্ঠিত প্রজাপতি করিল সন্ধান
অনূর্বরা প্রোষিতারে, বিরহীর চিত্রলিপি লয়ে;
কে পরাল রজনীর কনক বলয়ে
উষাহসিন্দুরবিন্দু গোধূলিলগনে;
সে-দিনের দক্ষযজ্ঞে, সার্বভৌম মিলনপার্বণে
পড়িল না তাই মোর ডাক।

(*মহাশ্বেতা*, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ, পৃ ২৯—৩০)[১]

বিদেশিনী প্রেমিকার স্মৃতিভার সতীর দেহত্যাগের স্মৃতিতে অন্বিত— সতীর গলিত শবদেহ বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়ে গঠন করেছিল 'মহাপীঠ' বা পুণ্যতীর্থ:

হায়, সতী,
তোমার শটিত স্মৃতি, খ'সে নিজ ভারে,
কামক্লিন্ন পীঠে সেথা স্থাপিত করেছে আপনারে।।
(*বিস্মরণী*, ঐ, পৃ ৫৩)

পার্থক্য এই, প্রেমতিক্ত প্রেমিকচিত্ত-নিঃসৃত এই পুরাণ-কল্পনায় পচনপ্রাপ্ত স্মৃতিপুঞ্জ নিজভারে খণ্ডিত হয়ে রচনা করেছে ক্লেদাক্ত পীঠস্থান। অথচ কবিতার প্রথমাংশে পুরাণ-অনুসারী ভাবচিত্র। আত্মদুঃখে মগ্ন কবি সতীহারা মহাযোগী শিব। রূপ-রসে নন্দিত ধরিত্রী তাঁর কাছে উপেক্ষিত। সে যেন হিমালয়নন্দিনী উমা, পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব, অনিন্দিতা সুন্দরী; কামদেবতা মদনও শরনিক্ষেপে উদ্যত, কিন্তু মহাধ্যানমগ্ন শিব ভ্রূক্ষেপহীন।

নবাগত ফাল্গুনের দিনে
ধরণী, উমার মতো, যবে মোর সমাধির মূলে
ফলে-ফুলে,
বর্ণে-গন্ধে, রূপে-রসে রচেছে প্রেমের উপহার,
তখনও মারের গৈবী ধনুর টংকার
শুনি নাই মুগ্ধ কান পেতে;
(ঐ, পৃ ৫২)

তারকাসূরের অত্যাচার থেকে ত্রিলোক রক্ষার নিমিত্তে প্রযোজন হয়েছিল এক মহাবীর সেনাপতির। ব্রহ্মার আদেশে দেবরাজ ইন্দ্র মদনকে পাঠান মহাদেবের তপোভঙ্গ-কার্যে, উদ্দেশ্য উমা বা পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের মিলন-সংঘটন এবং

উভয়ের পুত্র কার্তিকের সাহায্যে অসুর বধ। কিন্তু তপোভঙ্গের দূত মদন মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে ত্রিনয়নের বহ্নিজ্বালায় ভস্মীভূত হয়; পরে অবশ্য পঞ্চতপা পার্বতীর তপস্যায় প্রীত মহাদেব পার্বতীকে গ্রহণ করেন। মহাকবি কালিদাস '*কুমারসম্ভব*' কাব্যে এই পৌরাণিক কাহিনীর আশ্চর্য কাব্যরসময় রূপদান করেছেন।

'*ক্রন্দসী*'র '*অকৃতজ্ঞ*' কবিতায় আত্মপরিচিতিদান প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ এই পৌরাণিক প্রেক্ষিত ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করেছেন; পর পর চারটি স্তবকে ধ্বনিত নীলকণ্ঠ শিবের প্রচণ্ড অহংবোধ, সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বভাবের সংগে যার সাযুজ্য—

অন্তরঙ্গ সখাসম ফুলধনু আমার ইঙ্গিতে
ফুটায়েছে পারিজাত হিমরুক্ষ তুঙ্গ তপোবনে;
স্বয়ংবরা শৈলসুতা এসেছে কৌমার্য নিবেদিতে;
টুটেছে দুঃস্বপ্ন মোর ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলাচরণে।।

তবু মোর নীল কণ্ঠে উঠে নাই কামোদ ঝংকারি;
অনভ্যস্ত রসনায় উৎসারিত হয়নি দীপক।
মোর প্রিয়সম্ভাষণে বিরহের আশঙ্কা সঞ্চারি,
অন্তরের দ্বার জুড়ে হেসেছে অশ্লীল বিদূষক।।

গোপন বৈভব আমি ব্যক্ত কভু করিনি প্রিয়ারে;
বুঝি নাই বিনিময়; বিনা বরে কুড়ায়েছি পূজা;
অভিব্যাপ্ত ক্ষুধা মম অবরোধে ঘিরেছে তাহারে;
পরিতৃপ্তি বিতরিতে পারেনি স্বয়ং দশভুজা।।

নিমেষ না যেতে তাই ফুরায়েছে প্রথম আবেশ;
উন্মীলিত বিলোচন জ্বলিয়াছে বিপ্রলব্ধ লোভে,
অচিরাৎ সে-আগুন কামেরে করেছে ভস্মশেষ;
অপর্ণা সেজেছে চণ্ডী আত্মহিতে মোর উপদ্রবে।।
(অকৃতজ্ঞ , ঐ, পৃ ৯৩)

আবার, '*প্রাক্তনী*'র '*পুনরাবৃত্তি*' কবিতায় পাওয়া যায় কামদেবের বাণবিদ্ধ শিবের বিপরীত চিত্র। পরিস্রুত হলেও প্রথম পর্যায়ের এই কবিতায় দক্ষযজ্ঞ থেকে শুরু করে মদনভস্ম পর্যন্ত সমগ্র কাহিনী-রূপায়ণে কবির রোমান্টিক মানসিকতার পরিচয় চিহ্নিত—

সহসা অসাড় তুষার পড়েছে খসিয়া;
শুষ্ক কাষ্ঠে চ্যুতমঞ্জরী ধরেছে;

অতনুর ফুলসায়ক, বক্ষে পশিয়া,
আজি রুদ্রকে দক্ষিণমুখ করেছে।
পদতলে ব'সে গৌরী বদ্ধদৃষ্টি;
বরমালাধৃত করযুগ নিস্পন্দ:
পুনরায় নির্বিঘ্ন সকল সৃষ্টি;
স্বর্গ আবার, দেবাসুর নির্দ্বন্দ্ব।।
(*পুনরাবৃত্তি*, কা-স, পৃ ২১৩)

রুদ্র শিবের অপর নাম।[২] বৈদিক দেবতা রুদ্র উগ্র, হিংস্র, দুর্ধর্ষ, বজ্র ও ধনুর্বাণধারী, ধ্বংসের দেবতা। কিন্তু শুধু ভীষণতমই তিনি নন, তিনি শ্রেষ্ঠ ভিষক বা চিকিৎসক এবং পশু ও মানুষের আরোগ্যের দেবতা হিসেবে দক্ষিণমুখী।[৩] রুদ্রের দক্ষিণমুখ তাঁর প্রসন্নতা নির্দেশক। বসন্ত সহকারে মদনের আগমনে নির্জন শৈলশিখরে যখন জাগ্রত অপরূপ প্রাণতরঙ্গ, স্থবির তুষার গলিতপ্রায়, নির্জীব বৃক্ষে আম্রমুকুরের সমাগম, অতনুর ফুলশরবিদ্ধ শিব তখন নমনীয়; পদতলে উপবিষ্ট বরমাল্যধৃত গৌরী। এই মাহেন্দ্রক্ষণের চিত্র আরও বিস্তৃতভাবে '*কুমারসম্ভব*' কাব্যে চিত্রিত। তবে প্রচলিত কাহিনীতে শিব শরবিদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু কালিদাসের কাব্যে মদনের বাণবিদ্ধ হওয়ার আগেই মুহূর্তের জন্য সমাধি-বিচলনের কারণে শিবের বহ্নিজ্বালায় মদন দগ্ধ হয় এবং সেই নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ পুষ্পশরে বিদ্ধ হয় স্বয়ং গৌরী। সেই মুহূর্তের সমাধিভঙ্গে শিবের হৃদয়দোলার চিত্র এবং সবকিছুর তলাশ্রয়ী যে গোপন দৈবইচ্ছা কার্তিকের জন্ম-সম্ভাবনা সুধীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টির ব্যঞ্জনায় কবিতায়িত করেছেন—

.....হিমানীর সংহত নির্বাণ
বিনাশি মদন আনে বাসন্তীরে কার্মুকটংকারে;
ভাবের তরঙ্গভঙ্গ জেগে ওঠে স্রষ্টার ওংকারে
স্তম্ভিত কারণার্ণবে; সুদূরের বিপুল বিষাণ
ডাকে স্তব্ধ কল্পনারে; করিবারে ভর্তার সন্ধান
বিশুদ্ধ চেতনা সাজে মণিদীপ্ত দিব্য অলংকারে।।
(*বাক্য*, ঐ, পৃ ১২৪)

কিন্তু শিব কেবল ধ্যানমগ্ন 'মহেশ' নন তিনি জগৎ-সংহারক প্রলয়-দেবতা। তাঁর রুদ্র-নৃত্যের নাম তাণ্ডব।

আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন,
পায়ে তাণ্ডব জেগে উঠেছে;

হল　বিন্ধ্যের শাপবিমোচন,
পুন　সৌরলোকে সে ছুটেছে।
বুঝি　উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের;
যত　তৃষিত পিশাচ মড়কের,
তারা　মেতেছে গাজনে চড়কের;
সারা　বিশ্বের স্থিতি টুটেছে।
ওই　রসাতলে যায় ত্রিভুবন;
আজ　প্রলয়েশ জেগে উঠেছে।।
(অর্কেস্ট্রা, ঐ, পৃ. ৬৩)

যে বিরূপ অক্ষির জন্য মহাদেবকে বিরূপাক্ষ বলা হয়, সেই বিরূপ লোচন অর্থাৎ শিবললাটস্থ তৃতীয় নয়ন আজ উন্মীলিত, তাণ্ডব নৃত্যে সমগ্র সৃষ্টি স্থিতিভ্রষ্ট, এমতাবস্থায় শাপমুক্ত বিন্ধ্যপর্বতও যেন পুনরায় সৌরলোকে ধাবমান। বিন্ধ্য পর্বত একদা সূর্য কর্তৃক আত্মপ্রদক্ষিণের দাবীতে আকাশে মাথা তুলে সূর্যের পথ রোধ করে। ফলে সূর্যের উদয়াস্ত বিঘ্নিত এবং পৃথিবীর পক্ষে সৌরকর দুর্লভ হয়। দেবতারা তখন বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্যমুনির শরণার্থী হন। অগস্ত্য এলে বিন্ধ্য প্রণত হয় এবং গুরুদেব তাকে নির্দেশ দেন যতদিন তিনি প্রত্যাবর্তন না করেন, বিন্ধ্য যেন মস্তকোত্তোলন না করে। অগস্ত্য পয়লা ভাদ্র দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন এবং মলয়াচলে আশ্রম বেঁধে বাস করতে থাকেন। আর প্রত্যাবর্তন করেননি। এভাবেই বিন্ধ্য দমিত হয়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় রুদ্রের প্রলয়নৃত্যকালে যেন বিন্ধ্যপর্বত হয়েছে শাপমুক্ত, তাই সৌরলোকে তার অবাধ সঞ্চরণ। সুধীন্দ্রনাথ চরণে চরণে পুরাণ প্রয়োগে স্বতঃস্ফূর্ত। আবার শিবের নৃত্যকালে শুধু বিন্ধ্যপর্বতই উড্ডীয়মান হয়নি, নরকসমূহ উন্মুক্তদ্বার, ভূত-প্রেত-পিশাচ গাজনের চড়কোৎসবে মত্ত, অর্থাৎ বিলয়ের দেবতা রুদ্রের ধ্বংসলীলায় ত্রিভুবন রসাতলগামী। ভূত অর্থ প্রাণী, রুদ্রশিব থেকে সকল প্রাণীর উদ্‌ভব, অথবা বলা যায়, পঞ্চভূতের অধিপতি হিসেবে শিব ভূতনাথ বা ভূতপতি, পরে লৌকিক অর্থে এই ভূত প্রেতাত্মারূপে গৃহীত এবং ভূত-প্রেত-পিশাচসমূহ শিবানুচরের মধ্যে গণ্য। 'গাজন' শব্দটির প্রয়োগও সুকল্পিত। গাজন পূর্বে ছিল রাঢ়ের গ্রাম্যদেবতা ধর্মঠাকুরের উৎসব, পরে তা শিবপূজার সংগে অন্বিত হয়ে শৈব উৎসবে রূপান্তরিত হয়।[৪]

বৈদিক রুদ্রের ধ্বংসলীলা থেকে পরবর্তীকালে তাঁর নটরাজ মূর্তি জাত।

মৃন্ময় বিশ্বের চূড়ে নটরাজ অহর্নিশি নাচে
(*বিলয়*, ঐ, পৃ. ১৫৬)

এই নৃত্য কেবল প্রলয়সূচক নয়, মহাদেবের নৃত্যপর লীলামূর্তিতে দেবতার পঞ্চকৃত্য সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও তিরোভাব পরিস্ফুট। এই নৃত্যের তালে চলমান জীবন-মৃত্যুর অনন্ত প্রবাহ।

রুদ্র বা শিবের অপর নাম নীলকণ্ঠ। মহাভারত ও পুরাণানুসারে সমুদ্রমন্থনজাত কালকূট বিষ কণ্ঠে ধারণ করে শিব সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন। এ-কারণে তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত *'সর্বনাশ'* কবিতায়—

মহাকাল
আমার ঈর্ষার বিষে নীলকণ্ঠ কখনও হবে না।
(*সর্বনাশ*, কা-স, পৃ.৪৬)

অন্যত্র,

আসে মৃত্যু নীলকণ্ঠ, আসে মৃত্যু রুদ্র মহাকাল,
নিষ্পেষিত মানুষের শোণিতে গুলাল
চরণে অলক্তরেখা আঁকি।
হানো হে পিনাকী,
হানো তবে তব বিষবাণ;
(*প্রলাপ*, ঐ, পৃ. ৩৫)

শিবচরিত্রে বহুবিচিত্রগুণের সমাহার। যিনি ত্রিলোক মূর্চ্ছিত-করা অগ্নির ন্যায় গরল ধারণ করে লোকরক্ষা করেন, তিনিই মৃত্যুস্বরূপ মহাকাল—কল্পে কল্পে স্বীয় লীলামহিমায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয়সাধন করে চলেছেন। জগৎ সংহারক পিনাক-পাণি শিবই আবার উমাপতি, যোগীশ্বর মহাদেব, মহাপ্রেমিক। পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণে মোহন এই পৌরাণিক চরিত্রের পক্ষে কবিকল্পনাকে উদ্বোধিত করাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনায়, মৃত্যুচেতনায়, ঋতুরঙ্গচিত্রণে এই ভীষণ সুন্দর শিব-চরিত্র বিচিত্র রসসঞ্চার করেছে।

তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তারবৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌ববম্ বাজে গাল

দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি ওঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।[৫]

'উত্তরফাল্গুনী'র মানস-বিপর্যয়ের কোন এক মুহূর্তে সুধীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন—

নিহত সুন্দর শিব অনুচর পিশাচের হাতে
(অহৈতুকী, কা-স, পৃ. ১৪৫)

এই শিব প্রেম-স্থিতি-সৌন্দর্য-মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতীক, প্রেমিকার অনীহায় বিশ্বচরাচর যখন অরাজক, বিভীষিকাগ্রস্ত, কবির কাছে সত্য-সুন্দর-শিবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা পূর্বেই জেনেছি, রুদ্র-দেবতার কল্যাণরূপ শিব, যার অপর নাম শম্ভু বা সুখদাতা।

শুধু মহাদেব নয়, রক্তপিপাসু আদ্যাশক্তির শক্তিময়ী রূপ সুধীন্দ্রনাথ ভাষাচিত্রে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর মৃত্যুচেতনায় সংলগ্ন নরমুণ্ডমাল্যশোভিত দুর্গার কালীরূপী উগ্র নগ্ন ভয়াল মূর্তি—

নিঃশঙ্কিনী
জনারণ্য উন্মথি, সে চলে,
আস্ফালি উদ্ধত অসি, নির্জিতের মুণ্ডমালা গলে,
নির্মল নগ্নতাখানি বর্মসম পরি।
(*কস্মৈ দেবায়*, ঐ, পৃ. ১৬-১৭)

অথবা,

গৌরী কাপালিকা
দাঁড়াল সম্মুখে আসি, নরমেধ প্রলয়ের শিখা
প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।
মুখে রটে
নিবিদের মন্ত্র উচাটন;
তরল মাতনে ভরা ঘূর্ণ্যমান নীলিম নয়ন
হানে শিষ্ট সভ্যতার কঠিন সংহতি;
উদ্দাম প্রগতি
স্পষ্টতর বিমুখ কুন্তলে;
দলিত সুন্দর, শান্ত শিব পদতলে;
খর খড়্গে মুকুরিত সৃজনের প্রথম ভাস্কর;

তার ইষ্ট দেবতাও পুরাণ বর্বর,
যার তৃষ্ণা মিটাবার তরে
যুগে যুগান্তরে
সন্ধানে সে তপ্তরক্ত বলি।।
(*পুনর্জন্ম*, ঐ, পৃ. ২২)

প্রচলিত কাহিনী এই যে, কালী প্রলয়রূপ ধরে ঝড়ের গতিতে অসুরবিনাশে চলেছেন। তার গতিরোধের জন্য দেবাদিদেব মহাদেব নিজে পথের মধ্যে শায়িত এবং স্বামীর বক্ষে পদস্থাপন করে চমকিত দেবী। সুধীন্দ্রনাথ এই চমককে গুরুত্ব না দিয়ে দেবীর বর্বর রূপচিত্র মৃত্যুর অনুষঙ্গে সুপরিস্ফুট করেছেন। দার্শনিক ভাষ্যানুযায়ী শবের ন্যায় শায়িত শিব নিষ্ক্রিয় এবং কালী সক্রিয় শক্তি। মহাদেবকে প্রদর্শিত সতীর দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম হচ্ছেন কালী। কালী-সাধনার পীঠভূমি বাংলাদেশে বিভিন্ন সাধকের ধ্যানে কালীর বিভিন্ন রূপ। সুধীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে মুক্তকেশ, দিগম্বর, করালবদন, মুণ্ডমাল্যশোভিত, রক্তরঞ্জিত শিববক্ষে দণ্ডায়মান দক্ষিণ কালীর সচরাচর পূজিত মূর্তি কাব্যের উপজীব্য করেছেন এবং এই মৃত্যুরূপা দেবী মৃত্যুপথযাত্রী কবির অবচেতনায় সার্থকভাবে সন্নিবেশিত।

শিব-পার্বতীর কাহিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত মদন প্রসঙ্গ। পাঁচটি পুষ্পবাণের সাহায্যে ব্রহ্মার নির্দেশে যে সনাতন সৃষ্টিকার্যে রত, স্বয়ং ব্রহ্মাও যার বাণ থেকে পরিত্রাণ পাননি।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মদনের চিত্র—

কন্দর্প কুসুমাস্ত্র যেন, অধরের অঞ্চিত কার্মুকে
বিরল গুঞ্জনধ্বনি টংকারিছে, মথি কল্পলোক;
(*বিকলতা*, ঐ, পৃ. ২৬)

এবং তার অপরাজেয় অস্তিত্বের ইঙ্গিত,

মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে অবির্ভাব;
(*ভবিতব্য*, ঐ)

পঞ্চশর ভস্মীভূত হয়ে বিশ্বময় হয়েছে পরিব্যাপ্ত, সাকার দেবতা হয়েছে নিরাকার; প্রেমের মৃত্যু নেই, নব নব রূপে তার আবির্ভাব। মূলতঃ হরনেত্রাগ্নিতে

মদনভস্মের মূলে রয়েছে সৃষ্টিলগ্নে মদনবাণবিদ্ধ ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার অভিশাপ এবং মদন কর্তৃক প্রসাধিত হয়ে পুনর্বার তাকে নবজীবনলাভের বরদান। সুধীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রেমের প্রতীক-নির্মাণে বহুব্যবহৃত প্রেমবিগ্রহ রাধা-কৃষ্ণ অপেক্ষা শিব-পার্বতীর পুরাণ বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন—তবে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। এ সত্য অনস্বীকার্য, সুধীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড অহংবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আত্মভাবময়তা শিবচরিত্রের সংগে যত সমঞ্জস, কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তত নয়। *'উত্তরফাল্গুনী'*র একটি পর্যায়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের রূপক উপস্থাপিত—

যদিও আজিকে বীতনিঃশ্বাস
দীর্ণ আমার মোহন বেণু,
তবু হয়েছিল সে-সুরে সিদ্ধি,
যা শুনে ভ্রষ্ট কল্পধেনু
ফিরে আসে গোঠে গোধূলিবেলায়,
চপলতা জাগে রাধিকার পায়,
মধুমালতীর বন্ধ্যা শাখায়
উড়ে এসে লাগে সৃজনরেণু।
(*প্রতিদান*, ঐ, পৃ. ১৩৯)

এবং কালীয়-দমন সূত্রে 'কৃষ্ণ' প্রসঙ্গ—

তাহলে কি উদ্ধত অন্যায়
লুটাত আমার পায়ে বেণুমুগ্ধ কালীয়ের মতো?
(*অননুতপ্ত*, ঐ, পৃ. ১৪৮)

লক্ষণীয় উভয়ক্ষেত্রে পুরাণ-আধারে কবির অহংবোধ সুস্পষ্ট।

ঋগ্বেদে আর্যদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। দেবতারা রাক্ষসবধের জন্য ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। তিনি জন্মাবধি যোদ্ধা এবং শত্রুদমনকারী। কর্মদ্বারা তিনি অন্য সকল দেবতাকে অতিক্রম করেছেন, এ-কারণে তিনি দেবতাদের প্রধান। ইন্দ্রের প্রধান কীর্তি বৃত্রবধ। বৃত্রহা ইন্দ্র বৃত্র বা ব্যাপক মেঘ বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করে বর্ষণদ্বারা পৃথিবীকে পুষ্ট করেন। এই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রের দেবতা দম্ভোলিনিক্ষেপকারী ইন্দ্র প্রশ্নবিদ্ধ *'ক্রন্দসী'* কাব্যে—

যাযাবর আর্যের বিধাতা,
হুংকৃত পিনাক আজ বিরাজে কি ইন্দ্রধনুমাঝে?
মৃত্যুঘন প্রগল্‌ভ দম্ভোলি
পরিণত অমায়িক কুসুমসায়কে?
(*প্রশ্ন*, ঐ, পৃ. ৯৯)

'সংবর্ত' পর্যায়ে আর প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয় না। পারিপার্শ্বিকতার বৈরী বেষ্টনীতে বয়সী ইন্দ্রের অক্ষমতা সপ্রমাণিত--

আখণ্ডল নিরর্থক নামমাত্র: জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নারকী কীট; কুলিশপ্রহার
কম্পিত হাতের দোষে নির্দোষের মুণ্ডপাত করে।।
(*উজ্জীবন*, ঐ, পৃ. ১৮০)

'আখণ্ডল' ইন্দ্রের অপর নাম। সহস্রলোচন বা সর্বদ্রষ্টা হিসেবে ইন্দ্র সহস্রাক্ষ। তবে এই উপাধি লাভের পশ্চাতে একাধিক কাহিনীর অস্তিত্ব বর্তমান। যেমন *মহাভারতে* তিলোত্তমার রূপদর্শনের নিমিত্তে ইন্দ্রের সহস্রলোচন হওয়া অথবা পৌরাণিক কাহিনীতে অহল্যাধর্ষণের অপরাধে গৌতমের শাপে সহস্রযোনিলাভ এবং পরে তা সহস্র চক্ষুতে রূপান্তর, যে-কারণে ইন্দ্রের অপর নাম নেত্রযোনি। মঙ্গলকাব্যেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদে ইন্দ্র সহস্রাক্ষরূপে অভিহিত এবং সেখানে অহল্যা-প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। *রামায়ণে* ইন্দ্রকে অহল্যাগমনের পূর্ব থেকে সহস্রাক্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবশ্য সহস্র নক্ষত্র খচিত আকাশকে সহস্রাক্ষ বা ইন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৬]

পুরাণে ইন্দ্র বিশেষ কোন দেবতার নাম নয়। স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরই ইন্দ্র।[৭] দেবতা অথবা মানুষ যে-কেউ ইন্দ্রত্ব বা স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য লাভ করতে পারেন। তবে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞসমাপনাতে ইন্দ্রত্ব লাভ করা যায়। 'অর্কেস্ট্রা'রএকাধিক কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ এই দিকে অঙ্গুলিপাত করেছেন। প্রেমের স্বর্গে ঈশ্বর হিসেবে 'ইন্দ্রত্বের টিকা' লাভের উজ্জ্বল ইতিহাস সেখানে বিধৃত--

ক. মোর ভালে
একদা যে এঁকেছিলে ইন্দ্রত্বের টিকা,
(*কস্মৈ দেবায়*, কা-স, পৃ. ১৬)
খ. ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াস তপস্যার ফলে
(*ভবিতব্য*, ঐ, পৃ. ২৬)
গ. ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার
তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা,
(*মহাশ্বেতা*, ঐ, পৃ. ৩১)
ঘ. তাই বলেছিলাম, ইন্দ্রাণী
ইন্দ্রত্বের বিপর্যয়ে তুমি, দিবে আনি
প্রসন্ন স্বর্গের বর আগন্তুক তপস্বীর হাতে
অনাগত ফাল্গুনের প্রাতে।।
(*সর্বনাশ*, ঐ, পৃ. ৪৬)

আবার, ইন্দ্র চরিত্রের অন্ধকার দিকটিও তিনি স্পর্শ করেছেন,

সাঙ্গ কি সহস্র বর্ষ? গর্জে নিচে প্রচ্ছন্ন নরক,
পরশ্রীকাতর ইন্দ্র ঊর্ধ্ব হতে করে বজ্রাঘাত;
(*জাগরণ*, ঐ, পৃ. ১৬০)

'পরশ্রীকাতর' শব্দটি কালান্তরে ইন্দ্র চরিত্রের বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের যে বীরত্বব্যঞ্জক চিত্র প্রতিফলিত উত্তরকালে *রামায়ণ-মহাভারত* ও পুরাণে তা সর্বাংশে অনুসৃত হয়নি। প্রায়শঃ পৌরাণিক ইন্দ্র ভীরু, হীনকর্মে নিয়োজিত, ছলে-বলে-কৌশলে ইন্দ্রত্বরক্ষায় মনোযোগী; এ কারণে যেমন তিনি অপ্সরা প্রেরণের মাধ্যমে অনেক তপস্বীর তপস্যা বিনষ্ট করেছেন, তেমনি পৃথিবীতে কেউ যেন শত অশ্বমেধ করে ইন্দ্রত্বলাভে সমর্থ না হয় তজ্জন্য যে-কোন নীচতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেননি। উদ্ধৃত কবিতাংশে কবির মিলননিবিড় রাত্রির সুখস্বপ্নভঙ্গের কারণ হিসেবে ইন্দ্রের ঈর্ষাকাতর ভূমিকা নির্দেশিত।

ইন্দ্র প্রসঙ্গে আমরা নহুষের কাহিনী স্মরণ করতে পারি। *মহাভারত* অনুযায়ী ত্রিশিরা ও বৃত্রবধজনিত পাপে হততেজ ইন্দ্র মানসসরোবরে আত্মগোপন করলে দেবতা ও মহর্ষিরা পুণ্যবান, আত্মসংযমী ও যশস্বী রাজা নহুষকে ইন্দ্রপদ দান করেন। শত অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ করার জন্য নহুষ ইন্দ্রত্বের অধিকারও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু শত সহস্র বর্ষ রাজত্বের পর তিনি উদ্ধত ও বিলাসী এবং ইন্দ্রপত্নী শচীকে প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র হন। ফলে অগস্ত্যের শাপে তাকে সর্পে পরিণত ও স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয়। নহুষের ইন্দ্রত্বলাভের অনুষঙ্গে *'পরাবর্ত'* কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ মর্ত্যমানবের জয় ঘোষণা করেছেন—

মাটিই একান্ত সত্য, আর সব বৃথা বাক্যব্যয়,
সহস্র ইন্দ্রের শবে রত্নপ্রসূ এই মর্ত্যধাম।
হয়তো সে-শুভদিনে মরণের তুঙ্গ চূড়া হতে
সিদ্ধির ষোড়শ কলা কেড়ে নেবে বামন মানুষ;
সুন্দরের পদরেখা ধরা দেবে ধূলাঢাকা পথে;
আবার, সপ্তম স্বর্গে স্থান পাবে ধর্মিষ্ঠ নহুষ।।
(*পরাবর্ত*, কা-ল, পৃ. ১২৪)

প্রথম কাব্য *'তন্বী'* গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ উর্বশীর পুরাণ ব্যবহার করেছেন। সুন্দরী স্বর্গ-নর্তকী অপ্সরী উর্বশী অতি প্রাচীন কাল থেকে কবিকল্পনার এক বিশিষ্ট উপকরণ। ঋগ্বেদের সূক্ত থেকে বিবিধ পুরাণ ও কাব্য-কাহিনীর মাধ্যমে তার

অনিঃশেষ অভিযান। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত *'উর্বশী'* কবিতায় সমুদ্রমন্থনে উর্বশীর আবির্ভাব বিষয়ক (*রামায়ণের* বালকাণ্ডে বর্ণিত) এবং পুরূরবা–উর্বশীর প্রেম–বিষয়ক (*ঋগ্বেদ*, বিশেষত শতপথব্রাহ্মণে বিশদভাবে বর্ণিত) দুটি পুরাণ বৃত্তান্তই ব্যবহৃত হয়েছে। একদিকে নৃত্যপরা সুন্দরী অনন্তযৌবনা উর্বশীর অপরূপ সৌন্দর্য–চিত্র, অন্যদিকে বিরহী পুরূরবার (মর্ত্য–পুরুষ) হৃদয়ার্তিসূত্রে কবিতার বিপ্রলম্ভ আবহ—সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এই দুটি ভাব সক্রিয়। তবে রবীন্দ্রনাথের চোখে উর্বশী মানুষের শাশ্বত সৌন্দর্য–পিপাসার প্রতীক, সুধীন্দ্রনাথ সেই উর্বশীকে গ্রথিত করেছেন তার বাস্তব প্রেমের রূপানুরাগ ও বিচ্ছেদ–বেদনায়, কিন্তু রবীন্দ্রবৃত্তে অন্তরীণ থেকে—

ক. একদা এক তৃষ্ণাবিধুর বিনিদ রাতে
আলো–কালোর মূর্ছনাতে,
স্তব্ধ কালের রুদ্ধগতির অবকাশে,
বিশ্বভোলা মহোল্লাসে,
তোমার সুনীল চীনাংশুকের লহরমালা,
সিন্ধুসম, যখন, বালা,
ঘিরল তোমার রক্তচরণ আচম্বিতে,
লুপ্তস্বর্গ উর্বশীটির উদয় হল অবনীতে,
(*উর্বশী*, কা–স, পৃ. ৩৪০)

খ. যদি তুমি পরাস্কে আসীনা,
তবে কেন
আজও বাজে সৃজনের বীণা;
এখনও ভাঙে না তাল উর্বশীর হীরক নূপুরে?
(*সর্বনাশ*, ঐ, পৃ. ৪৭)

গ. পড়ল তোমার ব্যাকুল বসন টুটে,
বিশ্বম্ভর চরণপ্রান্ত চুমি;
ফিরল পুলক রিক্তাকাশে ছুটে।
কল্পলোকের উর্বশী কি তুমি?
(*অর্কেস্ট্রা*, ঐ, পৃ. ৬২)

অন্যত্র সুধীন্দ্রচেতনায় কালিদাস অনুস্যূত। দুটি উদ্ধৃতি—

ক. অমৃতলোকের কৌতুকে কাঁপে ক্রন্দসী;
পরিমণ্ডলে বাহিত অলকানন্দা;
ঝিল্লীর ডাকে মরধামে নামে উর্বশী;
তিমিরতোরণে ফুটেছে রজনীগন্ধা।
(*অর্কেস্ট্রা*, ঐ, পৃ. ৬৫)

খ.　　.....কোনও এক সন্ধ্যায় এমন-
যুগান্তে, জন্মান্তে যেন—শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী
অন্তর্দীপ্ত উদ্ভাসম করপুটে পড়েছিল খসি
অধরার মূক বার্তা মর্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।
সে-দিনে মুহূর্তকাল অবচ্ছিন্ন শরীর আমার
অম্লান, অনন্ত বীর্যে উঠেছিল উচ্চকিত হয়ে;
অনাদ্য ওংকারনাদে জেগেছিল প্রতন হৃদয়ে
চিরঞ্জীব পুরূরবা।।
(*ব্যবধান*, ঐ, পৃ. ১৩৭)

উভয় কবিতায় সন্ধ্যাসূচক প্রসঙ্গে *'উর্বশী'*র মিথ ব্যবহৃত। স্মরণীয়, কালিদাসের *'বিক্রমোর্বশীয়'* নাটকের সন্ধ্যালগ্ন, যখন রাজবাড়ীতে চলেছে সায়ংসন্ধ্যার আয়োজন, বিরহী পুরূরবার সম্মুখে ছিল রাত্রিযাপনের ক্লেশ এবং তখন অভিসারিকার বেশে উর্বশীর আগমন।

উর্বশী-পুরূরবার আখ্যান প্রয়োগে বরং সুধীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। ঋগ্বেদের সেই আশ্চর্য কাব্য ও নাট্যরসময় ট্রাজিক গাথায় উর্বশী বিহনে রাজা পুরূরবার যে হৃদয়ার্তি সুধীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতায় তার প্রতিধ্বনি, উর্বশী যেমন ক্ষণকালের জন্য আর্বিভূত হয়ে পুরূরবাকে চিরকালের বিরহে নিপতিত করেছিল বিদেশিনী লীলাময়ী প্রেমিকার ক্ষণিক স্থিতি সুধীন্দ্রনাথকেও অনুরূপ বিরহ-যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করেছে। সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে আবিষ্কার করেছেন প্রতারিত পুরূরবার রূপকে। *ঋগ্বেদের* কবিতায় পুরূরবা-উর্বশীর সংলাপের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে পলাতকা উর্বশীকে ধরে রাখার জন্য পুরূরবার ব্যাকুল মিনতি ধ্বনিত, *শতপথ-ব্রাহ্মণে* পাওয়া যায় পুরোপুরি গল্পরূপ যা *ভাগবত-পুরাণে* রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবেশিত। উর্বশী-পুরূরবার মিলনের অন্যতম শর্ত ছিল উর্বশী যেন অসময়ে রাজাকে বিবস্ত্র অবস্থায় না দেখেন। গন্ধর্বদের চক্রান্তে একদা মধ্যরাত্রে নগ্ন অবস্থাতেই পুরূরবা উর্বশীর মেষশাবক উদ্ধারার্থে বহির্গত হন এবং গন্ধর্বেরা বিদ্যুৎ প্রজ্জ্বলিত করে। ফলে উর্বশী অপসৃত হয়। শোকে ভগ্নস্বাস্থ্য রাজা দেশে দেশে উর্বশীকে অন্বেষণ করেন এবং অবশেষে কুরুক্ষেত্রে তার সন্ধান পান। হংসীরূপী অপ্সরা-সখীদের সঙ্গে উর্বশী তখন সরোবরে বিহাররত। ঋগ্বেদের কবিতায় পুরূরবার অনুনয়ে উর্বশী আর ফিরে আসেনি, তবে *শতপথ ব্রাহ্মণে* উর্বশী রাজাকে বৎসরকাল পরে একরাত্রির জন্য মিলন ও সন্তানদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। *শতপথ-ব্রাহ্মণের* কাহিনীর আভাস লক্ষ করা যায় নিম্নের কবিতাংশে—

ক. রিক্ততা মোর, নগ্নতা মোর, দৈন্য দেখি,
উর্বশী আজ পালিয়েছে কি?
(*উর্বশী*, কা-স, পৃ. ৩৪২)

খ. কেবলই চেয়েছি আমি, ক্ষতি কভু ছোঁয়নি আমারে;
কোনওদিন বজ্রাঘাতে সর্বস্বান্ত করেনি উর্বশী;
(*অকৃতজ্ঞ*, ঐ, পৃ ৯৩)

গ. .....সুতা-কান্তা-জননীর স্নেহ
অসপত্ন আচম্বিতে উৎকণ্ঠিত মুমূর্ষায় তার।—
পুরুজিৎ কুরুক্ষেত্রে উর্বশীর শেষ অভিসার।।
(*প্রতিপদ*, ঐ, পৃ. ১৬৫)

শিব-পুরূরবার ন্যায় রাবণের রূপকেও সুধীন্দ্রনাথের আত্ম-আবিষ্কার। আশাহত হৃদয়ের সেই অরুন্তুদ হাহাকার, একে একে নির্বাপিত দেউটি, নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলীর সেই দুর্ভার যন্ত্রণা—

হায়, গর্বান্বিতা,
দানবিক আত্মারে যে-অনির্বাণ রাবণের চিতা,
ভস্মান্ত না ক'রে, দহে হৃদয়সৈকতে,
ভাবো তুমি জন্মে জন্মে, পুনরুক্ত শপথে শপথে
যোগাও ইন্ধন তার লাগি?
(*কস্মৈ দেবায়*, কা-স, পৃ. ১৫)

অথবা,

সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ
সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা; আসুরিক সে-মহাপ্রয়াস
ধূমাঙ্কিত ব্যর্থতায় হয়ে থাকে যদি অবসান,
তবে ভস্মসিপাতে স্বাক্ষরিত কর সর্বনাশ।।
(*পরাবর্ত*, ঐ, পৃ. ১২০)

'সংবর্তের' একটি মাত্র চরণে বেদনা সূচীমুখ—

ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা
নির্বাণ সূর্যাস্তে।
(*কাস্তে*, ঐ, পৃ. ১৮৬)

এবং বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের প্রেক্ষিতে রাম-রাবণের যুদ্ধের প্রতি নিরাসক্ত ইঙ্গিত—

হয়তো সেখানে অশোককাননে বন্দী
বৈদেহী সাধে বিধাতারই অভিসন্ধি;
অন্তত বায়ু চন্দনে সৌগন্ধী,
স্বর্ণলঙ্কা রম্য অস্তরাগে।
রাম-রাবণের প্রত্ন রণের
জের তাহলেও ন্যস্ত বিশ্বামিত্র খিলে।।
(*প্রত্যাবর্তন*, ঐ, পৃ. ২০৭)

এই সূত্রে যুক্ত করা যায় যযাতি-প্রসঙ্গ। সুধীন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণ কবিতার শীর্ষনাম '*যযাতি*'। শুক্রাচার্যের শাপে অকাল জরায় পতিত রাজা যযাতির প্রচণ্ড জীবনতৃষ্ণা এবং পুত্র পুরু কর্তৃক জরা গ্রহণের পর দীর্ঘ সম্ভোগ-জনিত ক্লান্তি ও বাসনার অপরিতৃপ্তি সম্পর্কে নিশ্চয়জ্ঞান[৮] সুধীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই '*তন্বী*'র বার্ধক্যের ফাটে/যৌবনস্মরণদীপ্ত আকাঙক্ষার চোখ' (*অতন্দ্রায়*, কা-স, পৃ. ৩৪৮)। '*উত্তরফাল্গুনী*' পর্যায়ের প্রৌঢ় প্রেমিকের কবিতালগ্ন—

তন্ময় আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তদ্‌গত শরীর,
তথাগত অন্তর্যামী আত্ম-পর সবারে ক্ষমেছে,
ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে,
সার্বভৌম যৌবরাজ্যে প্রত্যাগত যযাতি স্থবির।।
(*জাগরণ*, কা-স, পৃ. ১৬০)

পুনঃযৌবনপ্রাপ্ত যযাতির সম্ভোগ-আনন্দ সমীভূত কবিও প্রেমিকার মিলননিবিড় রাত্রির পরিতৃপ্ত প্রশান্তিতে। এ-পর্যায়ের কবিচেতনায় 'যযাতি'র উপস্থিতি উভয়ের দ্বিতীয় যৌবনের রহস্যে; '*উত্তরফাল্গুনী*'র প্রৌঢ় কবির প্রেম এবং জরাগ্রস্ত 'যযাতি'র নবযৌবনজাত অনুভব সমসূত্রিক।

কিন্তু *সংবর্তে*-র '*যযাতি*' কবিতায় উভয়ের বিচ্ছিন্নতা নির্দেশিত—

উপরন্তু, দেবযানী -শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে;
অজাত পুরুর সঙ্গে ব্যাতিহার্য নয় দুর্বিপাক।
(*যযাতি*, ঐ, পৃ.২০৩)

উপর্যুক্ত স্তবকে দেবযানী- শর্মিষ্ঠার পরস্পর বিরোধে সুধীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবনের সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কোন সমালোচক।[৯] আবার, ''অজাত

পুরু'' শব্দবন্ধ সুধীন্দ্রনাথের সন্তানহীনতার দিকে দিকনির্দেশ করে। তবে যযাতির সংগে সুধীন্দ্রনাথের প্রধান পার্থক্য তাঁর অহংদীপ্ত আত্মচারণায়; মগ্নশৈলে তাঁর মাতাল নৌকা বিনষ্ট হলেও তিনি যেমন অনুতাপবিদ্ধ নন এবং জানেন 'নির্বেদ অশোভন' (কা–স, পৃ.২০১) তেমনি অকাল জরার অভিশাপও তাঁর নেই। কিন্তু যযাতির সংগে সুধীন্দ্রনাথের অন্তর্মিল আত্মোপলব্ধির সৈকতে। দেশ–কালের বৃহত্তর নৈরাজ্যে ''সম্ভোগের অনন্ত বঞ্চনা, পঞ্চাশে পা না দিতেই" (কা–স, পৃ. ২০৩) কবির কাছে স্পষ্ট, যযাতি যা উপলব্ধি করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। যযাতি অনন্ত সুখসম্ভোগে ক্লান্ত হয়ে আসক্তিমুক্ত, সুধীন্দ্রনাথ যুদ্ধে যুদ্ধে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে সত্যবিদ্ধ; প্রাচীর–প্রাকার সুরক্ষিত শান্ত জনপদ চিরকাল স্বপ্নশায়ী, খণ্ড বিশ্বে দ্বৈপায়ন অস্তিত্ব সবার, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনা অলীক এবং ''স্বকপোলকল্পিত সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত" (কা–স, পৃ. ২০৩)। যযাতির ন্যায় জরার অভিজ্ঞতা চয়নের আগেই বহুবিধ অভিজ্ঞতাঋদ্ধ কবি নির্বিকার এবং নিরাসক্ত—

> এবং চক্রান্তভুক্ত পূর্বাপর নিপাত, উদ্ধার
> যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা ঈর্ষাদি
> ক্ষেপাতে পারে না আর।
> (ঐ, পৃ. ২০৩)

সুধীন্দ্রনাথের পুরাণ ব্যবহারের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কালোচিত তাৎপর্যে তিনি পুরাণ প্রয়োগ করেন; পুরাণ তাই ব্যঞ্জনায় বহুধাবিস্তৃত। শিব ও ইন্দ্রের পুরাণ অনুরূপ লক্ষণবহ। এই সূত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি সূর্য–পুরাণ। যেমন *'অর্কেস্ট্রা'য়*—

> উৎকর্ণ চৈতন্য মম শুনেছিল সপ্তাশ্ব শকটে
> সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ,
> নব জীবনের বীজ ব্যোমের পরিধি—'পরে বুনি।।
> (অনুষঙ্গ, ঐ, পৃ. ২৮)

'সৃষ্টিধর' বা সূর্য আর্যদের উপাস্য দেবতা। ঋগ্বেদে হরিৎবর্ণ সপ্তাশ্ব যোজিত একচক্র রথে সূর্যের বিশ্ব–পর্যটনের উল্লেখ রয়েছে। মূলতঃ সপ্তাশ্ব সূর্যের সপ্তরশ্মি। তিনি মানুষের সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস, বিশ্বের প্রাণস্বরূপ—যেহেতু সূর্য থেকেই উত্তাপ ও বর্ষণ, শস্য–পুষ্পের অঙ্কুরোদ্‌গম, জীবের প্রাণ–যাত্রা; এ কারণে সূর্যকে আর্যরা বিশ্বস্রষ্টা হিসেবে বন্দনা করেছে। সুধীন্দ্রনাথের প্রেমপূর্ণ হৃদয় একদা অনুভব করেছিল সূর্যের এই অস্তিবাচক গতিশীলতা, কিন্তু *'উত্তরফাল্গুনীর'* শেষ কবিতা *'প্রতিপদ'* বহন করছে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র—

.....ইতিমধ্যে সন্নত আকাশে
রুগ্‌ণ আলোকের বীজ, পুরাতন, পীত, পরজীবী,
উপ্ত করে ধ্বংসকীট। আত্মহারা স্বয়ং সবিতা :
পৈতৃক প্ররোহে আজ পরিপ্লুত অজের দুহিতা।।
(*প্রতিপদ*, ঐ, পৃ. ১৬৪-৬৫)

দেশ-কালের পরিবর্তিত পটভূমিতে সূর্যের আলোককণা রুগ্‌ণ, সমস্ত প্রাণশক্তির উৎস ধ্বংস-কীটের জনয়িতা মাত্র। সবিতা[১০] সূর্যের অন্য নাম। সেই সবিতা আজ নীতিভ্রষ্ট, স্বীয় কন্যায় উপগত। *ঋগ্বেদে* সুন্দরী নায়িকা উষার প্রতি সূর্যের পশ্চাদ্ধাবন লক্ষ্য করা যায়, উষার জনক সূর্য। 'অজ' শব্দের অর্থ জন্মরহিত। 'অজ' ব্রহ্মার অপর নাম। প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীতে স্বীয় কন্যার (সন্ধ্যা, সরস্বতী ও শতরূপা) প্রতি ব্রহ্মার মোহ ও মিলনাকাঙ্ক্ষার পরিচয় বিবৃত।[১১] উল্লেখ্য, ব্রহ্মাই সূর্য বা সৃষ্টিকর্তা।[১২]

'*সংবর্ত*' পর্যায়ে উচ্চারিত হয়েছে—

.....নিরর্থক
পুষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক,
হিরণ্ময় পাত্র *ঠেলে ফেলে*,
দেয় মেলে
অন্ধ তম অতিপ্রজ বল্মীকে বল্মীকে।
(*সংবর্ত*, ঐ, পৃ. ১৯০)

জগতের পোষণকর্তা 'পুষা'[১৩] বা সূর্য 'একর্ষি'। অর্থাৎ তিনি আকাশে একা গমনশীল। কিন্তু সেই সুমহান সূর্যের একাধিপত্য আজ বিনষ্ট। 'অসূর্য' বা সূর্যহীনতার অন্ধকার গ্রাস করেছে সেই হিরণ্ময়পাত্র। চতুর্দিকে তমসার প্রবল বিস্তার। অতিপ্রজননশীল উইপোকার আবাস ক্ষয়ের অনিবার্য বৃদ্ধি নির্দেশক। সুধীন্দ্রনাথ যেন *ঈশোপনিষদের* ঋষির প্রার্থনার ব্যর্থতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। পুষা বা সূর্যের বিস্ময়কর হিরণ্ময় কিরণরাশির অন্তরালে সত্যস্বরূপের সন্ধান কাঙ্ক্ষিত ছিল *উপনিষদের* শ্লোকে—

হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।[১৪]

হিরন্ময় বা জ্যোতির্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। উপনিষদকার জগতের পোষক সূর্যকে সত্যধর্ম দর্শনের নিমিত্তে সে আবরণ উন্মোচনের প্রার্থনা

জানিয়েছেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় স্বয়ং সূর্য সে আবরণ অপাবৃত করার আগে 'অসূর্যের পুরাণ ঝলক' তা দূরে নিক্ষেপ করেছে এবং সত্য প্রকাশের পরিবর্তে প্রসারিত হয়েছে অন্ধ অন্ধকার। যুদ্ধ, মৃত্যু, নৈরাজ্যের পটভূমিবহ 'সংবর্তে'র পুরাণ-চেতনা অনুরূপ ব্যঞ্জনায় সংসক্ত।

'নচিকেতা'র পুরাণ ব্যবহারেও এই দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত। *'ক্রন্দসী'* পর্যায়ে যমের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে ইচ্ছুক যে নচিকেতার দর্শন পাওয়া যায় সে 'নিরুদ্বেগ' এবং 'মৃত্যুবিপ্রলব্ধ', কিন্তু *'সংবর্তে'র* নৈরাশ্যনিমজ্জিত পটভূমিতে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন।

ক. দাঁড়ায়ে যে -নির্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিল অধোমুখে চাহি
সম্ভোগরাত্রির শেষের ফেনিল সাগরে অবগাহি
কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
(*নরক*, কা-স, পৃ.১০৬)

খ. নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা;
(*প্রার্থনা*, ঐ, পৃ. ১২৭)

গ. নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আধু বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।
(*উজ্জীবন*, ঐ, পৃ. ১৮০-৮১)

'আত্মহা অসূর্যলোক' *উপনিষদের* একটি শ্লোকের[১৫] দিকে ইঙ্গিতপাত করে, যেখানে মৃত্যু-পরবর্তী সূর্যবিহীন বিষাদময় লোকে গমনকারী, কেবল দেহও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানসম্পন্ন এবং আত্মার অস্তিত্ব অনুধাবনে অক্ষম সাধারণ মানুষকে আত্মঘাতী বলা হয়েছে। সেই আত্মহননময় অসূর্যলোকের অন্ধকারে আজ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত, যেখানে আত্মসন্ধানী নচিকেতার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শংকরাচার্য অসূর্যলোক বলতে অসুরদের বাসভূমি বুঝিয়েছেন; অবশ্য এই অসুর সেইসব দেবতা যারা অদ্বৈতভাব গ্রহণে ব্যর্থ।[১৬] সুধীন্দ্রনাথ উল্লেখিত পূর্ববর্তী ''অসূর্যের পুরাণ ঝলক" এবং ''আত্মহা অসূর্যলোক" পৃথিবীব্যাপী অসুর-তাণ্ডব উপস্থাপনে উক্ত ব্যঞ্জনাবহ হতে পারে। নচিকেতার প্রসঙ্গ অবশ্য জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে-র কবিতায় লক্ষণীয়। জীবনানন্দে—

ক.　　সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে ভয় পাই—গুহায় লুকাই;
লীন হতে চাই–লীন–ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমদের দু'হাজার বছরের জ্ঞান এ–রকম।
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম প্রীত হয়।
তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।[১৭]

খ.　যারা বড়ো, মহীয়ান–কোনো এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হয়ে চলে গেছে;
একদিন নচিকেতা ব'লে মনে হ'তো তাহাদের;
একদিন আত্তিলার মতো তবু;
আজ তারা জনতার মতো।[১৮]

উদ্ধৃতিদ্বয়ে পৌরাণিক ব্যঞ্জনাধৃত 'নচিকেতা' নির্লোভ, সাহসী, সত্য–সন্ধিৎসু সত্তার প্রতীকরূপে কবি চেতনায় আশ্রিত হলেও কোন এক পর্যায়ে নচিকেতার দৃঢ়তা কবি খুঁজে পাননি। যাদের নচিকেতা বলে মনে হয়েছিল তারা জনতায় অবসিত। কিন্তু বিষ্ণু দে বলেন,

নচিকেতা চলে দৃঢ়, আশেপাশে অনাত্ম্য তস্কর
অলিতে গলিতে ঘোরে...।[১৯]

কবিমানসের ভিন্নতাগত কারণে বিষ্ণু দে যেভাবে উত্তরণ–অভীপ্সু, সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ তদ্রূপ নন। জীবনানন্দ বক্তব্যের প্রয়োজনে নচিকেতা পুরাণ ব্যবহার করেছেন, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে তাকে দিয়েছেন প্রতীকী তাৎপর্য। জীবনানন্দে যে হতাশা আমরা লক্ষ্য করি, সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কবিস্বভাবের কারণে তা প্রবল ও গভীর নৈরাশ্যবাদে চিহ্নিত। তবে তিরিশের প্রধান কবিত্রয়ের 'নচিকেতা' পুরাণ প্রয়োগে সমকালের সংকট–উত্তরণের গূঢ় অভীপ্সা কবিচৈতন্যে কিভাবে সক্রিয় ছিল, তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

'নচিকেতা' সংক্রান্ত সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে রয়েছে 'ত্রিশঙ্কু'র উল্লেখ। সুধীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় 'ত্রিশঙ্কু'র পুরাণ প্রতীকী ব্যঞ্জনাশ্রয়ী। রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভের প্রত্যাশায় কুলগুরু বশিষ্ঠকে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ এই অসম্ভব বাসনা প্রত্যাখ্যান করেন। বশিষ্ঠের ছেলেরাও রাজাকে উপহাস করেন। কিন্তু রাজার বারংবার অনুরোধ ও ঔদ্ধত্যে বশিষ্ঠ ও ছেলেদের অভিশাপে ত্রিশঙ্ক

চণ্ডালরূপে বনবাসী হন। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যাদ্বারা ঋষি হয়েছিলেন, বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতাহেতু তিনি ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল অবস্থায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থানদানের পরিবর্তে অধোমুখে পৃথিবীতে বিতাড়িত করেন। বিশ্বামিত্র তখন স্বীয় তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে অন্তরীক্ষে রাখেন এবং দক্ষিণ আকাশে অন্য এক সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেন। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রসৃষ্ট সেই দক্ষিণ আকাশে শোভিত হন। ঋষিদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ এবং দেবতার অসহযোগে ত্রিশঙ্কুর এই দোদুল্যমান অসহায়তা, জ্যোতিশ্চক্রের বাইরে নিঃসঙ্গ ট্র্যাজিক অবস্থান, সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যকবলিত মানসে দৃঢ় ও গভীর ছাপ মুদ্রিত করেছে, ত্রিশঙ্কুর ট্রাজেডি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ব্যক্তি ও বিশ্বের পটে—

ক. তাই তোর বৈজয়ন্তী দর্শকের বিদ্রূপ জাগায়,
বিপ্রলব্ধ অনুযাত্র শঙ্খনাদে রহে নিরুত্তর;
প্রতীকীর অশ্বমেধ শুধু শূন্যে অধিকার পায়,
নিশ্চিন্ত স্বর্গের হাস্যে অপ্রতিষ্ঠ ত্রিশঙ্কু অমর?
(*পরাবর্ত*, কা-স, পৃ. ১২১)

খ. নির্বাণ সর্বতোভদ্রঃ প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে। অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বগত।।
(*প্রতিপদ*, ঐ, পৃ. ১৬৫)

গ. কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু এবং সে খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ।
(*যযাতি*, ঐ, পৃ. ২০৩)

*'ক্রন্দসী'*র গোলাপী নেশায় ভরা স্বপ্নভঙ্গে তথা ব্যক্তিক ব্যর্থতার উপলব্ধিতে অনুভূত হয়েছিল ত্রিশঙ্কুর হাস্যকর অবমাননা, *'উত্তরফাল্গুনী'*র শেষ কবিতায় শব-শিবা-সর্পের সংসর্গে যখন কবির কাছে মরুভূমি শ্রেয়তর, ত্রিশঙ্কুর তখন আকস্মিক আবির্ভাব। *'সংবর্তে'* বেদনা বিপুলতর। 'আমি' থেকে 'আমরা'-বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর পটভূমিতে 'ত্রিশঙ্কু' এবং 'দ্বৈপায়ন' সকলে, সার্বিক অসহায়তা এবং নিঃসঙ্গতার প্রতীক।

'সংবর্ত' পর্যায়ে আমরা লক্ষ করি *'নৈমিষারণ্যে'*র পটভূমি। অবশ্য ১৯৩৭-এ রচিত *'উত্তরফাল্গুনী'*র শেষ কবিতায় 'নৈমিষারণ্যে'র প্রথম উল্লেখ—

পর্যুষিত কারণের উগ্র গন্ধ উতল নিঃশ্বাসে,
সর্বাঙ্গে পাংশুল ক্লেদ, তন্দ্রাবিষ্ট পৃথুল পৃথিবী
নির্জন নৈমিষারণ্যে।
(*প্রতিপদ*, কা, স, পৃ. ১৬৪)

এবং তারপর--

ক. আমাদের পটভূমি নিরপেক্ষ, নিষ্ফল নৈমিষ।
(*উপসংহার*, ঐ, পৃ. ১৭৮)

খ. নিতান্ত পশেনি আজও যে-নৈমিষে পিশাচী প্রভাব,
সেথাও অনন্যসিদ্ধি ঊর্ধ্বশ্বাস প্রেয়সীর বর।।
(*সংক্রাম*, ঐ, পৃ. ১৮৫)

গ. পঞ্চাশে পা না দিতেই, অন্তর্যামী নৈমিষে নির্বাক;
(*যযাতি*, ঐ, পৃ. ২০৩)

পুরাণ প্রসিদ্ধ তপোবন নৈমিষারণ্য, যেখানে নিমেষ মধ্যে গৌরমুখ মুনি বা বিষ্ণু ভস্মীভূত করেছিলেন অসুর সৈন্য, সৌতি পাঠ করেছিলেন মহাভারত, শৌনক মুনি পালন করেছিলেন দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ এবং কলিযুগের ভয়ে ব্রহ্মার নির্দেশে মুনি-ঋষিরা নিয়েছিলেন আশ্রয়, *'উত্তরফাল্গুনী'র* কবি দেখেছেন তার নির্জন পবিত্রতা লঙ্ঘিত, কেননা সেখানে ক্লেদাক্ত পৃথুল পৃথিবীর তন্দ্রাগ্রস্ত অবয়ব সোচ্চার। কিন্তু, *'সংবর্তে'* যখন প্রার্থনা প্রতিকারহীন, বিশ্বদেউল অতিদৈব, শিবের ত্রিশূল কিংবদন্তী, পুরাণ-সংহিতা শূন্যগর্ভ হিসেবে প্রমাণিত, তখন 'নিরপেক্ষ' 'নিষ্ফল' নৈমিষারণ্যই অনন্যসঙ্গল যুগলের কাছে কাঙিক্ষা বলে প্রতীয়মান হয়—

অতীতের পক্ষাঘাত, ভবিষ্যের বাচাল কুলিশ
অনাথ দুর্গের ধ্বংস রটাবে না কপোতকূজনে:
অক্ষমের আবশ্যিক ক্ষমা
এখানে কীর্তিত নয়, বন্ধুত্বের বিড়ম্বনা নেই;
(*উপসংহার*, কা-স. পৃ.১৭৮)

কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে এই প্রত্যাশা দৃঢ়মূল হতে পারে না, তাই 'খ' ও 'গ' চিহ্নিত উদ্ধৃতির হতাশা ক্ষরিত হয়। বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও কালিমার বৈপরীত্যে সুধীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করেছেন এই পুরাণোক্ত শান্ত, পবিত্র, পক্ষপাতশূন্য তপোবনের পটভূমি যা কালিক-যন্ত্রণা-বিমুখ কবিচেতনার সংকেত।

'সংবর্ত' পর্যায়ের কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ বক্তব্য প্রকাশে বিশেষভাবে পুরাণ-সম্পৃক্ত। নিম্নোদ্ধৃত বিবিধ পুরাণ প্রসঙ্গে নৈরাজ্য এবং হতাশা সুস্পষ্ট—

ক. অশক্য পিতা; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবেনা স্বর্গরাজ্য তবে।
(*নান্দীমুখ*, কা-স, পৃ.১৭৭)

খ. শুষ্ক ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন বিষ্ণু;
(*কাস্তে*, ঐ, পৃ. ১৮৭)

গ. নির্বাণ নভে গৃধ্নু রাহুর গ্রাস;
(১৯৪৫, ঐ, পৃ. ২০০)

ঘ. অন্তত এ-পরিবেশে মানুষের প্রার্থনাসমূহ
জাতিস্মর অভিমন্যু;
(*যযাতি*, ঐ, পৃ. ২০৪)

ঙ. তারা যেন নীলকণ্ঠের উদ্‌গীর্ণ
যুগান্তরের অজীর্ণ হলাহল।
(*প্রত্যাবর্তন*, ঐ, পৃ.২০৮)

শক্তির অহমিকায় কলুষিত পৃথিবী অথচ পরশুরাম নিস্পৃহ, সৃষ্টিরক্ষার জন্য বারংবার বিভিন্ন অবতারে যার আর্বিভাব সেই পরমপালক বিষ্ণুর আত্মমগ্নতা, রাহুর আগ্রাসী উপস্থিতি, শত্রুবেষ্টিত অভিমন্যুর অসহায়তা এবং নীলকণ্ঠের গরল উদ্‌গিরণ সবকিছু একযোগে অসহায় অথচ দুর্বিষহ পরিস্থিতি নির্দেশক।

এই অনুভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে শেষকাব্য 'দশমী'র বৃহদাংশ পুরাণ প্রযুক্ত।

ক. অভাব হয়তো স্বভাবেরই অগ্রজ;
নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ—
প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে;
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু;
পৃথিবী অনাথ; যথেচ্ছ পরমাণু;
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে।।
(*প্রতীক্ষা*, কা-স, পৃ. ৩১১-১২)

খ.　　কিন্তু চক্রচর কাল; সুরাসুর
বিশ্বে সমবল, সম্পূর্ণ পৃথিবী উষর, উর্বর
একাধারে, ধর্মে, কর্মে, শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর—
তা আমার সমবয়সীরা মানেনি, মানিনি আমি;
ফলে আমাদের নিয়তি অগস্ত্যযাত্রা, অনুগামী
হত বা বিস্মৃত ফণিমনসার বনে।
(*তীর্থপরিক্রমা*, ঐ, পৃ. ৩১৬)

গ.　শষ্পশ্যাম কুরুক্ষেত্রে অবিচল নিত্যের সমাধি;
(*ভূমা*, ঐ, পৃ. ৩১৭)

ঘ.　　আগামী কাল বিষাবশেষ ক্ষিপ্ত পারাবারে ভেসে ওঠে।
তাকিয়ে থাকে পঙ্গু নাবিক: ভূষণ্ডী কাক রক্তপঙ্ক খোঁটে।।
(*প্রত্যুত্তর*, ঐ, পৃ. ৩২০)

ঙ.　ডুবসাঁতারে দুর্যোধনের হিংসাবোধন
আবিল করে বৈতরণীর ধারা
(*অসংগতি*, ঐ, পৃ. ৩২০)

প্রভাস বা সোমতীর্থে কৃষ্ণের দেহত্যাগের ইঙ্গিত, ব্রহ্মার মাথা কেটে আনা শিবানুচর কালভৈরবের রুদ্র অভিযান এবং স্থাণু বা স্থির ধ্রুব, সনাতন পুরুষ শিবের চরমতম উচ্ছৃঙ্খলতা 'ক' চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে ব্যঞ্জিত করেছে সর্বাত্মক ধ্বংস, এবং মৃত্যুর কালো ছায়া। অনুরূপ নৈরাশ্য 'খ'-এ। সেখানে পুরাণ-কথিত দেব ও দানব অর্থাৎ শুভ ও অশুভ শক্তির সম-আধিপত্য এবং অগস্ত্যযাত্রার সংকেতে কবি ও তার অনুসারীদের সর্ব প্রচেষ্টার অনন্তকালের জন্য অবসান নির্দেশিত। গ, ঘ এবং ঙ পরস্পর সম্পর্কিত। ক্ষণবাদী চেতনাধৃত হলেও 'গ' কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সমাধি-যজ্ঞের স্মৃতিবহ, ঘ-এ পুরাণ বর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ ভূষণ্ডী কাকের রক্তপঙ্ক-মন্থন একই ধ্বংসাত্মক চেতনা-প্রসূত। কলির এই ভূষণ্ডী কাক পৃথিবীর আবহমান কালের ঘটনা পরম্পরার সাক্ষী।[২০] কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলে কৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে যে জানিয়েছিল সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে সে অনায়াসে দৈত্যরক্ত ও মাংস গ্রহণ করেছিল, ত্রেতাযুগে লঙ্কা-যুদ্ধেও তাকে তেমন পরিশ্রম করতে হয়নি, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তার কষ্ট ছিল সীমাহীন। অর্থাৎ, এই যুদ্ধ যেমন তীব্র, দীর্ঘস্থায়ী এবং করুণ অন্য যুদ্ধগুলি তদ্রূপ নয়। 'ঙ' অংশে কুরুবংশ ধ্বংসের নায়ক ক্ষমতালোভী, কূট, ধর্মজ্ঞানশূন্য দুর্যোধনের অবিনাশী চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিতদান করা হয়েছে। আজীবন

পাণ্ডবদের অনিষ্টসাধনে তৎপর, ঈর্ষা ও বিদ্বেষের অগ্নি-দগ্ধ দুর্যোধনের প্রতিহিংসার সমাপ্তি ঘটেনি মৃত্যুর পরও। নরক-প্রবেশের পূর্বে অতিক্রম্য দুর্গন্ধ ও রুধিরপূর্ণ খরস্রোতা বৈতরণীর ধারা যেন এই হিংসা দ্বেষের উদ্বোধনেই আবিলগ্রস্ত।

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাচ্য পুরাণের ব্যাপক ও সমৃদ্ধ প্রয়োগ লক্ষ করেছি। সুধীন্দ্রনাথ কিছু কিছু প্রতীচ্য-পুরাণ ব্যবহার করেছেন; তবে বিস্ময়কর এই যে, পাশ্চাত্য-চেতনাপুষ্ট কবির ব্যবহৃত প্রতীচ্য-পুরাণের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতায় রোমক পুরাণের ফন-প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়:

> অপ্সরীতে প্যানে খেলে কি লুকাচুরি?
> (অর্কেস্ট্রা, কা-স. পৃ. ৫৮)।

ছাগলের কান, লেজ ও পা ওয়ালা অর্ধ মানুষ প্যান রোমক ফন, হার্মিসের পুত্র, আর্কেডিয়ার বনভূমির দেবতা, মেষ ও মেষপালকের প্রতিপালক। ক্রীড়াপরায়ণ, ছল-চতুর, অপ্সরী-প্রেমিক এবং অনির্দেশ্য চরিত্রের।[২৯] স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথের ভাষ্য—

> ১৯৫৩ অর্ধদেবতা, রোমক পুরাণের ফন্, ভারতীয় কিন্নরদের মতোই, সংগীতবিলাসী। কিন্তু তারা গায়ক নয়, বেণুবাদক; এবং হয়ত তাই, যেমন আমাদের মুরলীধর, তারাও তেমনই লাম্পট্যের প্রতিমূর্তি। কারণ তাদের অগ্রনায়ক প্যান্-এর অনুধাবন থেকে বাঁচার অন্য পথ না পেয়ে, সিরিংস নামক অপ্সরী একদা বেতসের রূপ ধরেছিল;এবং উক্ত নলেই ফন্-সম্রাটের প্রথম বাঁশি নির্মিত।[২২]

'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় পাগলবায়ু এবং চলচঞ্চলা নদী সুধীন্দ্রচেতনায় প্যান্ ও অপ্সরীর মিথ জাগ্রত করেছে। অপ্সরী সিরিংসের প্রথমে আত্মগোপন এবং পরে বেতসের রূপধারণের মাধ্যমে প্যানের হাত থেকে আত্মরক্ষার যে প্রয়াস এবং প্যানের পশ্চাদ্ধাবনে যে লুকোচুরি খেলার জন্ম সুধীন্দ্রনাথ তারই সংকেত গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, পিটিস এবং ইকো অপর দুই জন অপ্সরী, প্যানের হাত থেকে বাঁচার জন্য যাদের একজন পাইন গাছে এবং অপরজন খণ্ড বিখণ্ড এবং শুধু ধ্বনিতে পরিণত হয়।[২৩] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'সংবর্ত' পর্যায়ে সুধীন্দ্রনাথ অনূদিত ফনের দিবাস্বপ্ন শীর্ষক মালার্মীয় কবিতা।

'*ক্রন্দসী*' কাব্যগ্রন্থের '*পরাবর্ত*' কবিতায় লক্ষণীয় হোমারের মহাকাব্য 'ওডিসি'র নায়ক গ্রীক বীর ওডিসিয়াস বা ব্রোমক বীর ইউলিসিসের অনুষঙ্গ।

> অজ্ঞাত সিন্ধুর মর্মে, জাদুকরী অধরা যেখানে
> উৎকর্ণ অর্ণবপোত ধ্বংস করে অপ্সরসংগীতে,
> সেথা বাঁধি নিজ দেহ, মুদি চক্ষু, অবরুদ্ধ কানে
> পারায়ে যা পরিচিতা সুন্দরীরে বরমাল্য দিতে।।
> (*পরাবর্ত*, কা-স, পৃ. ১২২)

ট্রয় পতনের পর ইথাকায় স্ত্রী পেনেলোপীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে ওডিসিয়াসের যে দীর্ঘ, বৈচিত্র্য ও বিপদসংকুল সমুদ্র-অভিযান এখানে তারই একটি প্রসঙ্গের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যাত্রাপথে সাইরেন জাতি তাদের দ্বীপ থেকে ঐন্দ্রজালিক মধুরতম সঙ্গীত মূর্ছনায় ওডিসিয়াসের জাহাজ আকৃষ্ট করে পাহাড়ে বিধ্বস্ত করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু ওডিসিয়াস এই ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর জন্য সঙ্গীদের কান গলিত-মোমে রুদ্ধ করে এবং নিজেকে মাস্তুলের সংগে শক্ত করে বেঁধে রাখতে নির্দেশ দেয়। সঙ্গীদের প্রতি আরো নির্দেশ ছিল যে তার সহস্র কাকুতি-মিনতিতেও যেন এই বন্ধন মুক্ত করা না হয়। এই ভাবে সাইরেনদের সঙ্গীত শ্রবণ করেও ওডিসিয়াস দলবলসহ এই ভয়ঙ্কর এলাকা অতিক্রম করে। কবিতাংশে এই মিথের আলোকে সুধীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার স্বপ্নজাল অতিক্রম করে ওডিসিয়াসের দৃঢ়তায় নিজেকে বাস্তবানুগ করার জন্য প্রাণিত করেছেন।

গ্রীক পুরাণের জেসনকে নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন '*সংবর্তে*'র '*জসন্*' শীর্ষক সম্পূর্ণ কবিতা ওডিসিয়াসের ন্যায় জেসন্ও নিজের রাজ্য উদ্ধার-কল্পে ভেড়ার স্বর্ণলোম আহরণের জন্য অর্ণবপোতে সমুদ্রপথে অভিযান করে এবং ভয়াবহ বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রমের পর মায়াবিনী মিডিয়ার সহায়তায় সফলকাম হয়। জলযাত্রায় বিপদ-তাড়িত আত্মবিশ্বাসী জেসনের অস্তিত্বের সঙ্গে স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথের জীবন-অভিজ্ঞতা সাযুজ্য সন্ধানী—

> ভাঙাহাল ধ'রে থাকি; ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই;
> লুপ্ত প্রায় মানচিত্রে চাই/ ভুলে যাই একা আমি; সঙ্গে ছিল যারা/
> প্রলুব্ধ বন্দরে কিংবা পথকষ্টে আজ আত্মহারা,
> কে কোথায় প'ড়ে আছে, জানি না ঠিকানা।
> (*জেসন্*, কা-স, পৃ. ১৮২)

অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি জেসনের ন্যায় সুধীন্দ্রনাথকেও নাড়া দেয়—

ফের এসে জোটে
উচ্ছল অর্ণবপোতে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ বীর যত;
গুরুদীক্ষা, বাহুবল, সহায় দৈবত
তরায় সমূহ বিঘ্ন, নিরুদ্দেশে গন্তব্য চেনায়।
(ঐ, পৃ. ১৮৩)

মিডিয়ার সূত্রে কি উঁকি দেয় স্মৃতিশায়ী বিদেশিনীর প্রবঞ্চনা ও কবি-হৃদয়ের হাহাকার?

পুনরায়
স্বয়ংবরা পণ্ড করে মায়াবীর চক্রান্ত, চাতুরী;
হাহাকারে ভরে রাজপুরী
তার উগ্র রিরংসায়, অভিসারী ঝড়ে
সবিতার বলি লুটে, পলাতক তরীতে সে চড়ে।।
(ঐ)

অকুতোভয় গ্রীক বীরদের পুরাণ-অনুষঙ্গ *'যযাতি'* কবিতায়ও পাওয়া যায়—

হিংস্র অরি
বন্দরে বন্দরে, অবিশ্বাস্য অনুচর, অবহেলা
চরমে নিশ্চিত জেনেই, বেরিয়েছিল তারা।।
(ঐ, পৃ. ২০১)

জেসনের স্মৃতি উদ্রেককারী অপর একটি কবিতা 'উন্মার্গ' যেখানে পুনরায় সমীকৃত হয় সুধীন্দ্রনাথ ও জেসনের অভিজ্ঞতা—

ঢেউ গুনে গুনে, কেটে যায় বেলা
সিন্ধুতীরে:
জানি পুনরায় ভাসাব না ভেলা
অবাধ, অগাধ, অপার নীরে।
তবে মাঝে মাঝে কেন মনে পড়ে
পালের স্ফূর্তি উদ্দাম ঝড়ে;

এই কবিতার 'অনাথ দ্বীপ', অপ্সরীদের নিভৃত বিলাস' (কা-স, পৃ. ২০৫) প্রভৃতির উল্লেখ জেসনের স্মৃতিবহ। 'অপ্সরীদের নির্মম জলকেলি' (ঐ, পৃ. ৩১৫) *'দশমী'* র *'দ্রষ্টতরী'* কবিতায় পুনর্বার চিত্রিত যেখানে গ্রীক পুরাণের জেসন্ এবং ফন উভয়ের অনুষঙ্গ ধ্বনিত—

আপাতত তাকে নাচাতে পারে না আর
অপ্সরীদের নির্মম জলকেলি;
সে বুঝেছে বৃথা অজানার অভিসার--
পাতকের দ্বারে জাতকের ঠেলাঠেলি।।
(কা-স, পৃ. ৩২৫)

এবং এখানেও উৎসারিত সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যবহ হৃদয়ের সংবাদ।

পুরাণ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এত নিবিড়ভাবে সুস্পৃক্ত যে, শুধু এই বিষয়ের তাৎপর্য ও প্রবণতা অনুধাবন করলেই আমরা কবিমানস ও কাব্যভাবনার সমীপবর্তী হতে পারি। আমরা লক্ষ্য করেছি, কিভাবে সুধীন্দ্রনাথের মানস-বিবর্তনের সঙ্গে পুরাণ-চেতনার মাত্রাগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, গৃহীত হয়েছে নূতন উপজীব্য, কাব্যরচনার প্রথম ও শেষ পর্বের পুরাণ প্রসঙ্গে সূচিত হয়েছে পার্থক্য। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি সুধীন্দ্রনাথের অহংসচেতন অথচ যন্ত্রণাদীর্ণ মানস কিভাবে শিব-রাবণ-যযাতি-জেসনের সঙ্গে সামীপ্য বোধ করেছে। মূলতঃ পুরাণ সুধীন্দ্রচেতনায় একদিকে যেমন দেশকালমাত্রিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ, অন্য দিকে তেমনি কবিমানসের প্রতীকী দলিল।

তথ্যনির্দেশ

১ সম্পা: বুদ্ধদেব বসু, ১৯৬২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সং ১৯৭৬।

২ **The Rudra of the Vedas has developed in the course of ages into the great and powerful god Siva, the third deity of the Hindu triad, and the supreme god of his votaris.....Under the name of Rudra or Maha-kala he is the great destroying and dissolving power. But destruction in Hindu belief implies reproduction; So as Siva or Sankara, 'the auspicious' he is the reproductive power which is perpetually restoring that which has been dissolved, and hence is regarded as Iswara, the supreme lord, and Maha-deva, the greal god.' John Dowson, Siva, A classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, history & literature, Tenth Ed., Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1961, p.297-98.**

৩ রুদ্র দেবতার দুই মেজাজ ছিল, প্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ। প্রসন্ন মেজাজে দক্ষিণ মুখে তিনি আরোগ্যের দেবতা, পশু-মানুষের 'ভিষক্তম'। ক্রুদ্ধ মেজাজে রুদ্র মুখে তিনি

ধ্বংসের দেবতা, বিশেষ করিয়া অপরাধীর ও পশুর। ডক্টর সুকুমার সেন, ১৩৬৯, *ঋগ্‌বেদ-কথা, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস*, গ্রন্থপ্রকাশ, কলিকাতা, দ্বি-প্র ১৩৭৩, পৃ.১২।

৪ ....ধর্মঠাকুর রাঢ় দেশে গ্রাম্যদেবতারূপে রূপায়িত হয়েছেন। তাঁর গ্রাম্য জন্মোৎসবের নাম হয়েছে গাজন। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। বিনয় ঘোষ, ১৩৬৩, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, পুস্তক প্রকাশক, পৃ.৪৯।

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১, ৪৫ নং, *উৎসর্গ*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ৫ম সং ১৩৮৭, পৃ.৯৩।

৬ দ্র. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬১, *দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম, বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ৫ম মুদ্রণ, ১৩৮০, পৃ. ৭৯০।

৭ Indra in the puranas, is not the name of a deity, but a title for the king of god. The life of one Indra is said to be a hundred divine years, after which period a god or even a meritorious mortal is raised to the throne. The surest way for anyone to become Indra is to perform one hundred sacrifies on the completion of which the reigning Indra has to abdicate. P. Thomas, *Epics, Myths & Legends of India*, p.7, উদ্ধৃত, ডক্টর হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১৯৭৭, *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, ১ম পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., কলিকাতা, দ্বি-সং ১৯৮২, পৃ. ২৫৩।

৮ রত্নসম্পূর্ণা পৃথিবী, সুবর্ণ, পশু ও বণিতা, এ-সমস্ত বস্তু একজনের উপভোগ্য হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্যাপ্তি হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, সম্ভবপর্ব, *মহাভারত*, বর্ধমান রাজবাটী বঙ্গানুবাদ, কলকাতা, ১ম ভারবি সং ১৯৭৬, পৃ. ১৮৯।

৯ ....in the last section where the author hints the disharmony of his two marriages. Amiya Dev. 1982, *Sudhindranath Dutta*, Sahitya Akademi, New Delhi, p.89.

১০ যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে। সেই সবিতার কাল। সায়নাচার্য্য বলেন যে, উদয়ের পূর্বে যে মূর্ত্তি সেই সবিতা.....। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, বঙ্কিম রচনাবলী*-২, পৃ.৭৯৬-৯৭।

১১ As the father of men, he performs the work of pro-creation by incestuous intercourse with his own daughter, variously named vach or Saraswati (speech), Sandhya (twilight), Satarupa (the

hundred formed) etc. John Dowsjon, *A classical Dictionary of Hindu Mythology*, p.57.

১২ ভারতীয় দেবতানিচয় স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি বা তেজোময়ী শক্তি হওয়ায় ব্রহ্মাও অবশ্যই সূর্যাগ্নির রূপভেদ। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুকৃত ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মাই সূর্য... *মৎসপুরাণ* আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে আদিত্যই প্রথম জাত বলে ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের দুই অংশ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন,...। ডক্টর হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ১৯৭৮, *ব্রহ্মা ও সন্ধ্যার উপাখ্যান, হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, ২য় পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., কলিকাতা, পৃ. ৪০৩-০৪।

১৩ যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, 'পুষ' ধাতু পোষণ থেকে পূষা শব্দ নিষ্পন্ন। রশ্মি দ্বারা সূর্য জগৎ পোষণ করে। যাস্ক, Wilson, Max Muller সূর্যকেই 'পূষা' হিসেবে নির্দেশ করেছেন। দ্রঃ. পূষা, *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*-১, পৃ.১৩৩-৩৪।

১৪ শ্লোক-১৫, *ঈশ উপনিষদ, উপনিষদ*অখণ্ড সং, এপ্রিল ১৯৮০, অনু ও সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পুন- মু. অক্টোবর,১৯৮০,পৃ.২৫।

১৫ দ্র. ঐ, শ্লোক ৩,পৃ.৯।

১৬ ঐ, পৃ. ১০।

১৭ জীবনানন্দ দাশ, *ইতিহাসযান, বেলা অবেলা কালবেলা, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার*, সম্পা. রণেশ দাশ গুপ্ত, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কো :, ঢাকা, পরিবর্ধিত ৪র্থ সং, ১৩৮১,পৃ. ৩৩৩-৩৪।

১৮ ঐ, *অনুসূর্যের গান, সাতটি তারার তিমির*, পৃ. ২৭৯।

১৯ বিষ্ণু দে, ১৩৮০, *জন্মাষ্টমী ১৩৫৪, আলেখ্য, বহুর পঁচিশ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বি-মু ১৩৮১, পৃ. ১৪৩।

২০ এই ভুশুণ্ডি কাক বশিষ্ঠকে পাঁচবার জন্মাতে দেখেছে, পাঁচবার পৃথিবী জলমগ্ন হয়েছে দেখেছে, কূর্মমূর্তি, বার বার সমুদ্র মন্থন, তিনবার হিরণ্যাক্ষের দ্বারা পৃথিবীকে পাতালে নিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেছে। পরশুরাম ও রামকে ছয়বার এবং ছয়টি কলিযুগে বুদ্ধকে ছবার জন্মাতে দেখেছে। ত্রিশ বার ত্রিপুর দহন, দু বার দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হওয়া, মহাদেবের দ্বারা দশ জন ইন্দ্র বধ এবং বাণাসুরকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে মহাদেবের সাতবার যুদ্ধ করা দেখেছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ একে যুদ্ধ সম্বন্ধে মতামত চাইলে কাক বলেছিল সত্যযুগে শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধে স্বচ্ছন্দে সে সৈন্যদের রক্তমাংস খেয়েছিল; লঙ্কার যুদ্ধে তাকে কিছুটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার কষ্টের পরিসীমা ছিল না। অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৯, *পৌরাণিকা*, ২য় খণ্ড, ফার্মা কে এল এম (প্রাঃ) লিঃ কলিকাতা, পৃ. ১০৬।

২১ Like his father Hermes, he is an Arkadian deity, but unlike him, never fully human in form, being regularly shown with the horns, ears, and legs of a goat. Goatish also is his character, for he is lustful and playful, a vigorous and fertile deity, on occation short of temper, especially if disturbed in his noontide rest. H.J.Rose, 1928, *Lesser and Foreign Deities, A Handbook of Greek Mythology.* Methuen & Co Ltd. London, Sixth Ed. 1958, pp.167-68.

২২ ভাষ্য, ফনের দিবাস্বপ্ন,প্রতিধ্বনি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৩০১।

২৩ See, H.J.Rose, A *Handbook of Greek Mythology*, pp.168-69.